হিন্দু
অর্থ ও তাৎপর্য

স্বামী মৃগানন্দ



শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর
১, ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

প্রকাশিকা ঃ
সন্ন্যাসিনী তপোময়ী পুরী
শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর
কলকাতা-৭০০০৩২
ফোন ঃ ২৪১২-১৩৭২, ২৪১২-০৭৬৯
২৪১৪-২২২১, ৩১০১৭২৬২

প্রথম সংস্করণ ঃ ১ মে, ১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১ নভেম্বর ১৯৯৮
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২৪, অক্টোবর, ২০০৩
শ্রী শ্রী কালী পূজা

মুদ্রক ঃ
শ্রী ভরত বৈদ্য
মিতা প্রিন্টকো
৯, মন্মথ গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-২

প্রণামী ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

প্রকাশিকার নিবেদন

বর্তমানে 'হিন্দু' এই শব্দটি নিয়ে সাধারণ লোকের মনে নানা প্রশ্নের ঝড় উঠেছে। তার একমাত্র কারণ এই শব্দটির অপব্যাখ্যা এবং এই শব্দটিকে কেন্দ্র করে নানা অপপ্রচার। এই শব্দটি সম্বন্ধে সকলের মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগুক এবং হিন্দুশব্দের সঠিক অর্থটি তাদের বোধগম্য না হোক, এটি বেশ কিছু লোকের কাম্য বলে মনে হয়। তারা তাই হিন্দু শব্দটিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা মানুষকে ভ্রান্তপথে চালিত করছে তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাই সাধারণ মানুষ আজ বিভ্রান্ত।

পবিত্র 'হিন্দু' শব্দটির কোন বিকল্প নেই। এটি সাম্প্রদায়িক বা সংকীর্ণ কোন শব্দ নয়। বরং আকাশের ন্যায় অসীম উদার এর বিস্তৃতি। 'হিন্দু' এই একটি ছোট্ট শব্দে রয়েছে বহু তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতনা। 'হিন্দু' শব্দের সঠিক পরিচয়টি তুলে ধরেছেন স্বামী মৃগানন্দ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। 'হিন্দু' শব্দের তাৎপর্যগুলির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি অপূর্ব যুক্তিনিষ্ঠ একটি আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ নিবেদন করছি, এই নিবন্ধটি দুটি অংশে প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে দৈনিক 'বর্তমানে'। বহু জ্ঞানীগুণী এই লেখাটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং স্বধর্মনিষ্ঠার শিথিলতাজনিত দেশের এই তমসাচ্ছন্ন দিনে এরকম একটি লেখা জনসাধারণের মনে যথেষ্ট শুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বর্তমানে এই ধরণের সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্ট রচনার বহুলপ্রচার প্রয়োজন।

তাই সকলের অনুরোধে এই প্রবন্ধটিকে একটি ছোট্ট পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি।

আশা করি, মৌলিকচিন্তা প্রসূত এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে বহু লোকের 'হিন্দু' শব্দ সম্বন্ধে সংশয় দূরীভূত হবে এবং তাঁরা বুঝবেন 'হিন্দু' অবজ্ঞা ও অপপ্রচারের বস্তু নয়। 'হিন্দু' শব্দটির সঠিক মূল্যায়নই দেশবাসীর পক্ষে অন্ধকার থেকে অলোয় উত্তরণের পথ।

মাতৃচরণাশ্রিতা,
সন্ন্যাসিনী তপোময়ীপুরী

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর,
১, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-৩২
১ মে, ১৯৯৪

হিন্দু
অর্থ ও তাৎপর্য

বিবেকানন্দ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন—"আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনও মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।"........"আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময় সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত হইবে, অথবা উহা দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোন মন্দ জিনিস বুঝায় বুঝাক। এস আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোনও ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে।"..."আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।"...."এখন ধর্ম ও হিন্দু—এই দুইট শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব। ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই।"

ভারতের জাতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহাবাণীগুলির মধ্যে জাতীয় গৌরবের মূল সুর ধরা পড়েছে। 'হিন্দু' শব্দটির মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন 'ধর্ম' শব্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং ভারতের সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন সহ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশ। ভারতে উদ্ভূত অসংখ্য ধর্মমার্গ অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে। আবার এই প্রবাহ অনন্ত। নিত্যনূতন ধর্মমার্গ তৈরী হচ্ছে, এবং হিন্দুত্বের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে পুষ্ট হ'তে পুষ্টতর করে তুলছে।

রুচি এবং সংস্কার অনুসারে চিন্তা এবং উপলব্ধির স্বাধীনতা থেকেই সুরু হয়েছে অসংখ্য সম্প্রদায়। ক্রমশঃ সম্প্রদায়গুলি এক একটি পূর্ণাংগ ধর্মমতের

রূপ পরিগ্রহ ক'রে এক একটি সার্বভৌম সত্তা প্রকাশিত করেছে এবং স্বতন্ত্রভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈদিক, বৈদান্তিক, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি অগুন্‌তি মত ও পথ সৃষ্ট হয়েছে কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ ইষ্ট, শাস্ত্র, প্রবক্তা, গুরু, আচার্য, আচার-আচরণ, অনুশাসন, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা প্রভৃতি সবকিছু, যা ঐ সকল ধর্মমত বা ধর্মমার্গের বা সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিকশিত করে।

সনাতন শাশ্বত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গুণে ভারতে উদ্ভূত সমস্ত ধর্মই এক মৌলিক ঐক্যভূমির সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে বস্তুগত সমতা ও সাদৃশ্য।

এই অসংখ্য নামে পরিচিত বহু ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, আচরণ ও সামাজিকতা ইত্যাদির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একরূপতা ধরা পড়েছিল বহুযুগ আগে, কোনও এক অমৃত লগনে, কোনও এক দ্রষ্টার দৃষ্টিতে। তিনি হয়তো সিন্ধুর ওপার থেকে এসেই দেখেছিলেন এই অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠেছিলেন— অদ্ভুত এই 'হিন্দু'জাতি! অপূর্ব এই 'হিন্দু' ধর্ম! অনন্য এই 'হিন্দু' সভ্যতা! যে মহানুভব দ্রষ্টার মুখে হিন্দু শব্দটি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তাঁকে নমস্কার।

হ্যাঁ, সেদিন পৃথিবীর বুকে এক নূতন স্ফোটরূপেই ধ্বনিত হয়েছিল 'হিন্দু' শব্দটি, যেন নামগোত্রহীন অজনবীর মুখে প্রণবেরই নবতর প্রকাশ। সে হয়তো সিন্ধুকে হিন্দু বলতো। তাতে কি? সে যা বললো, যা বলতে চাইলো, তা এক মহান্ তত্ত্বেরই আবিষ্কার। 'হিন্দু' এই ছোট্ট শব্দের এক ছোট্ট বন্ধনীতে সে বেঁধে দিয়েছিল শত সহস্র স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যকে। কারণ, ঐ বৈচিত্র্যের মধ্যে সে দেখেছিল তাদের অন্তর্নিহিত বস্তুগত সাম্যকে।

এই বাস্তব সাম্যের মূল তত্ত্বরূপে সে নিরীক্ষণ করেছিল—হিন্দুগণ সকলেই যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তাদের ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণায় আপাতপার্থক্য দেখা যায় নিশ্চয়ই। যেমন, কেউ তাঁকে নিরাকার নির্গুণ বলে মানে। তারা মানে না ঈশ্বরের গুণ আছে রূপ আছে বা তিনি সৃষ্টির কর্ত্তা। কিন্তু তারাও একভাবে তাঁকেই মানে পরব্রহ্ম কিংবা পরমতত্ত্বরূপে। আবার কেউ তাঁকে মানে সরূপ সগুণ বলে। কেউ তাঁকেই চিৎশক্তিরূপিণী মা বলে ডাকে, কেউ বলে সচ্চিদানন্দ, পরমাত্মা কিংবা ভগবান। সকলেরই আছে স্বপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ। আবার শুধু মানা নয়, জানা চাই। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই হিন্দুধর্মের মর্মবাণী। পরোক্ষ জ্ঞান নয়, চাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কারণ, হিন্দু বিশ্বাস করে যে, তাঁকে জানা যায়। আর শুধু জানাই বা কেন, তাঁকে পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে মনের মতো একটা সম্পর্কও স্থাপন করা যায়।

কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্মল অন্তঃকরণ। তিনি শুদ্ধমনের গোচর। তাই বাসনা কামনা ত্যাগ, বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ, ক্রোধ-মোহ-ঈর্ষাদি রিপু সকলের ত্যাগ, এমনকি দেহবোধেরও ত্যাগ সকল হিন্দুরই চলার পথ বা ধর্মমার্গের সাধারণ নির্দেশ। এই ত্যাগ তপস্যা ও সত্য অহিংসার পথ অনুসরণ পূর্বক পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জনের দ্বারা কৈবল্যলাভ করা যায়, ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। আবার ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে ভক্তিপ্রেমও আস্বাদন করা যায়।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পুনর্জন্ম ইত্যাদি সকল হিন্দুরই তাত্ত্বিক বিশ্বাস। সে জানে আত্মার আদিও নেই অন্তও নেই। কর্মানুসারেই চলে দেহের আশ্রয়ে তার আসা আর যাওয়ার চক্র। জন্মান্তরবাদ হিন্দুর সাধারণ মান্যতা। সামান্য হেরফের বাদ দিলে এ ধরণের অসংখ্য বিষয়ে ভারতের মূলস্রোতের সব মতপথের মানুষের একই কথা একই সুর একই ভাব একই চাওয়া। ভোগময় পশুজীবন থেকে উঠে এসে ক্রমে ত্যাগময় দেবজীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হিন্দুর লক্ষ্য। সেই

লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় সে বলে দিতে চায় বিশ্বের সব মানুষকে। দেশকাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলকামনাই সকল হিন্দুর অভিপ্রায়।

সেদিন 'হিন্দু' এই একটি শব্দের বেষ্টনী তার বিরাট বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল সমস্ত সমভাবাপন্ন ধর্মমতকে। তাদের প্রত্যেকের সার্বভৌমত্বকে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তাদের মিলিয়ে নিয়েছিল এক আঙিনায়। একটি শব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের সামগ্রিক সত্তা। এই সামগ্রিক সত্তা শুধু ধর্মবাচক নয়। এর মধ্যে রয়েছে জাতিবাচক পরিচয়, সভ্যতাবাচক পরিচয়। আবার এরই মধ্যে রয়েছে সিন্ধু সরস্বতীর তীর থেকে শুরু ক'রে বিশাল আর্যাবর্তের ভৌগোলিক পরিচয়। আর সর্বোপরি এই হিন্দু শব্দের মধ্যেই রয়েছে এই মহান জাতিকে সুদৃঢ় ঐক্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার মহাশক্তি।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এই সহজ ব্যাপারটা। বুঝেছিলেন, এই সহজ ব্যাপারটার গভীরতা, প্রসারতা এবং তাৎপর্য্য। উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু শব্দটির অনন্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবধর্ম, বসুধৈবকুটুম্বকম্ বিশ্বমেকনীড়ম্ প্রভৃতি ধারণা এবং সমস্ত উদার মানবিক মূল্যবোধকে ধরে রাখার একমাত্র আধার হচ্ছে 'হিন্দু'। ভারতের স্বকীয়তাকে পূর্ণরূপে ধরে রাখার শক্তি 'হিন্দু' শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। আবার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধানের ক্ষেত্রেও 'হিন্দু' শব্দের কোনও বিকল্প নেই।

অবশ্য তথাকথিত স্বাধীন ভারতের সংবিধানে আমদানি করা হয়েছে 'সেক্যুলার' নামক শব্দটিকে। অনেকে মনে করেন এই শব্দটি 'হিন্দু' শব্দকে বিতাড়িত ক'রে চিরকালের মতো তার স্থান দখল করে নেবে। কিন্তু আদতে সেক্যুলার শব্দটি 'হিন্দু' শব্দের বিকল্প নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দ। সেক্যুলার শব্দের অভিধানগত অর্থগুলি জানলে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

Monier Williams, Oxford, Random House, A. T. Deb প্রভৃতি প্রামাণ্য অভিধানে 'সেক্যুলার' শব্দের অর্থ হচ্ছে— (1) Pertaining to worldly things or to things that are not regarded as religious, spiritual or sacred; (2) Not pertaining to or connected with religion (Opposed to sacred); (3) Temporal ; (4) Profane ; (5) Lay ; (6) Not distinctively sacrad or essential ; (7) Not monastic etc. সংস্কৃত এবং বাংলায় বলা হচ্ছে— লৌকিক, ঐহিক, সাংসারিক, পার্থিব বিষয় সম্বন্ধী, যা কিছু অধ্যাত্ম-বিষয়ক নয়, লোকায়ত, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি। 'সেক্যুলারিজ্‌মে'র অর্থ বলা হয়েছে— (1) A system of political or social philosophy that rejects all forms of religious faith; (2) The view that public education and other matters of civil policy should be conducted without the introduction of a religious element. বাংলায় বলা হয়েছে—রাজ্য, শিক্ষা, নীতি ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার মতবাদ।

সোজা ভাষায়, 'সেক্যুলার' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'ধর্মবর্জিত'। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটার অর্থই হচ্ছে ধর্মের অপেক্ষা নাই। ধর্মের স্থান নাই, প্রয়োজন নাই। সবটাই না-বাচক বর্জন-বাচক। অতএব 'সেক্যুলার' শব্দে কখনই সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দান, সকলের ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি অর্থ বুঝায় না।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে অভিধানের সবগুলি বিশ্ববিদিত অর্থকে অস্বীকার ক'রে সেক্যুলার শব্দের একটা অদ্ভুত অর্থ বানিয়ে দেওয়া হোল — সর্বধর্মসমভাব। দেখানো হ'তে লাগলো সেক্যুলার শব্দটি কত উদার সহিষ্ণুতায় প্রতিষ্ঠিত! ধর্মনিরপেক্ষ কথাটার মানে করা হোল— প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা! কোন্ ব্যাকরণের কোন্ ব্যুৎপত্তিতে এটি সিদ্ধ হয়, জানা নেই। তাই মনে হয়, এর চেয়ে বড় প্রহসন কিংবা এর মতো অসত্য-কথন আর কি হ'তে

পারে! আরও আশ্চর্য্যের কথা, অগুন্‌তি ডিগ্রীধারী শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি এ ব্যাখ্যা নির্বিচারে মেনে নেন! আর যত্র তত্র সর্বত্র এই অর্থ প্রচার করেন এবং নিজেকে 'সেক্যুলার' বলতে গর্ববোধ করেন। তাঁরা কোন্ জাদু-দণ্ডের ছোঁওয়ায় মায়াচ্ছন্ন হয়েছেন জানি না।

দেশ যেদিন সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হোল, সেদিন ঠাকুর সত্যানন্দ আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন—"এটা আবার কি হোল? এখন তো ধর্ম বলেই কিছু থাকবে না, বিশেষ ক'রে হিন্দুধর্ম।" তারপর একজন শিক্ষককে বললেন—"এখন আর কি শেখাবেন আপনারা? এখন তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তো আর ধর্মের অপেক্ষাই রাখে না। শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে হিন্দুধর্ম বাদ যাবে। সমাজও হয়ে যাবে ধর্মহীন। আপনারা সকলে যদি সচেতন না হ'ন, তাহলে ঘোর দুর্দিন আসবে দেশে!"

ভারতবর্ষে সবরকম শুভ নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে হিন্দুধর্ম— একথা সকলেই জানেন। হিন্দুত্বকে সরিয়ে সেক্যুলারিজম-কে আনার একটাই তাৎপর্য্য, একটাই ফল— সেটা হচ্ছে ঢালাও দুর্নীতির পথ পরিষ্কার করা। এ কথার প্রমাণ—এই সেক্যুলার রাষ্ট্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে আজ ভুরি ভুরি বিদ্যমান। সেক্যুলারিজ্‌ম নামক বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে জাতির সর্বাঙ্গ হয়েছে বিষজর্জর। তবু হুঁশ নেই।

শুধু তাই নয়, যে অর্থটি মুখে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমভাব, প্রয়োগ ক্ষেত্রে তার মধ্যেও রয়েছে উৎকট বৈষম্য। সেখানেও সংবিধান দিয়েছে সংখ্যালঘু ধর্ম সম্প্রদায়কে শত শত বাড়তি সুবিধা ও নিরাপত্তা। যার ফলে ইদানীং হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও নিজেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার প্রবণতা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ভাগ্যের পরিহাস না কালচক্রের আবর্ত জানি না। তবে এটা যে 'সেক্যুলারিজ্‌ম' নামক হিন্দুবিরোধী নীতির দুঃখজনক পরিণাম, তা নিশ্চয় বলা যায়।

'সেক্যুলার' শব্দ যে হিন্দু-বিরোধী শব্দ, তাতে তর্কের অবকাশ নেই। এখন দেখা যাক্ হিন্দুর বিকল্প শব্দ হিসাবে কি কি শব্দ সামনে আসে। হিন্দুর বিকল্প শব্দ রূপে আমাদের কাছে সাধারণতঃ আসে সনাতন, আর্য, বৈদান্তিক এবং ভারতীয় ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ। এই শব্দগুলির পাশাপাশি হিন্দু শব্দটিকে বসালেই তফাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সনাতন' বলতে বুঝায় প্রাচীন, অবিনশ্বর, নিত্য কিংবা চিরস্থায়ী ধর্ম। তাহলে নবীন, পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী কিংবা অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ধর্মমতগুলির কি হবে? সনাতন কথাটি প্রধানতঃ ধর্মবাচক। কিন্তু ভারতের প্রাচীন নবীন সব ধর্মকে সনাতন পদবাচ্য বা সনাতন শব্দের অন্তর্গত বলা যায় না। তাছাড়া, সনাতন শব্দটি একাধারে জাতি, সভ্যতা ও ভৌগোলিক পরিচয়বাচক শব্দও নয়। হিন্দু বললে সনাতন বুঝায়, কিন্তু সনাতন বললে হিন্দুর সবটুকু বঝায় না।

'আর্য' বলতে বুঝায় মানী, পূজ্য, সদাচারনিষ্ঠ, সংস্কারপ্রাপ্ত, প্রাচীন সুসভ্য জাতি। তাহ'লে কি অনার্যদের কিংবা শূদ্রদের কিংবা শূদ্রেতরদের বাদ দিতে হবে অ-সভ্য জাতি বলে? হিন্দু কিন্তু সর্বগ্রাহী শব্দ। হিন্দুর মধ্যে আর্য-অনার্য, উচ্চজাতি-নিম্নজাতি, দলিত-নিপীড়িত, বনবাসী-গুহাবাসী, কোল-ভিল-সাঁওতাল, মুচি-মেথর-চণ্ডাল সব একত্রে এসে পড়ে, কেউ বাদ যায় না। অধিকারী ভেদ তো থাকবেই। সেটা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক পন্থা। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দটি গণ্ডীভাঙা শব্দ। হিন্দু বললে আর্য বুঝায়, কিন্তু, আর্য বললে হিন্দুর সবটুকু বুঝায় না।

'বৈদান্তিক' শব্দটিতে ধর্মের অনুষঙ্গই প্রধান। এই শব্দে চরম অদ্বৈত জ্ঞানের পথে পাড়ি দেওয়া পথিকদেরই বিশেষভাবে বুঝায়। অদ্বৈত জ্ঞান নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ জ্ঞান, অদ্বৈত ভাব নিশ্চয়ই উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু যারা বেদবেদান্ত জানে না, কিংবা মানে না, যারা শুধু মা মা বলে ডাকে, কত দেবদেবীর পূজা করে, তাদের তাহ'লে কোথায় স্থান হবে? আবার বৈদান্তিক শব্দটি একাধারে জাতি সভ্যতা ও

ভৌগোলিক পরিচয়বাচক শব্দও নয়। হিন্দু বললে বৈদান্তিক বুঝায়, কিন্তু বৈদান্তিক বললে হিন্দুর সবটুকু বুঝায় না।

'ভারতীয়' বললে প্রথমে মনে হয় খুব উদার বৃহৎ সর্বগ্রাহী শব্দ। কিন্তু এর মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেটার দিকে দিতে হবে আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আজ থেকে হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুস্থান, তথাচ ভারত এবং 'হিন্দু' শব্দকে একার্থবাচক হিসেবে হয়তো ধরা যেতে পারতো। কারণ, তখনও ভারতে ইস্‌লাম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম তেমন প্রবেশাধিকার পায়নি। তাদের আগমনের পরই ক্রমশঃ ভারতের হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব দিক থেকে হতে লাগলো বিপর্যস্ত। ধর্মান্তরকরণের ফলে গড়ে উঠলো অহিন্দু সম্প্রদায় যাদের ধর্ম বিশ্বাস সংস্কৃতি সভ্যতা সবই সম্পূর্ণ পৃথক এবং বহুলাংশে বিপরীতধর্মী। হিন্দুর সঙ্গে তাদের আকাশপাতাল তফাৎ। সেই জড়বাদ ভোগবাদ সাম্রাজ্যবাদ-সর্বস্ব বিধর্মী মতগুলি ভারতীয় ভূমিতে আনলো এক অসমভাবাপন্ন ভাবধারা। এদের কিছুতেই মেলানো যায় না হিন্দুর মৌলিক ধ্যানধারণার সঙ্গে। হিন্দুদের সমভাবাপন্ন অসংখ্য ধর্মমার্গ থেকে ঐ বিধর্মী মতগুলি নিজস্ব পার্থক্য বজায় রেখেই চললো। সুদীর্ঘ কাল পরে দেখা গেল ভারতমাতা হয়েছেন ত্রিখণ্ডিত।

বিদেশী ধর্মমতগুলি হিন্দু এবং অহিন্দু গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে ভারতীয় জনগণকে। এক বেষ্টনীতে তাদের ধর্মসংস্কৃতি কখনই সংযুক্ত হয় না, হতে পারে না। দুধের সঙ্গে দুধ যত খুশী যখন খুশী যেখান থেকে খুশী মেশানো যায়। কিন্তু দুধের সঙ্গে কখনও চূনগোলা কিংবা লেবুর রস মেশানো যায় না। তারল্য ছাড়া এদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই। বরং দুধের সঙ্গে মেশালে দুধ কেটে যায়। এটা বাস্তব ও পরীক্ষিত সত্য।

হ্যাঁ, আজ হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতিরূপী দুধ কেটে কেটে যাচ্ছে। মিলিজুলি সংস্কৃতির নামে চাপানো ঐক্যের ঠেলায় হিন্দুদের সব মৌলিকতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এবং এটা হচ্ছে শুধু হিন্দুদের। এসব কথা ভেবে দেখার সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ভারতীয় বলে এখন যা চালানো হচ্ছে, তা এক চাপানো ঐক্য, যার ভেতরের বৈষম্য উৎকটরূপে প্রকট হয়ে উঠছে দিন দিন। আর ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে নিত্য নূতন ফাটল। তাই ভারতভূমির অন্তর্গত গুণগত বস্তুগত সাদৃশ্যযুক্ত অসংখ্য ধর্মমার্গকে এক 'হিন্দু' ছাড়া অন্য কোনও শব্দই সঠিক ব্যক্ত করতে পারে না।

আজ ভারতীয় বললে ভেসে ওঠে একটা বিকৃত পরিচিতি—একটা distorted identity. ভারতের আসল পরিচয় বা True identity-র সবটাই ফুটে ওঠে এক 'হিন্দু' শব্দে। তাই 'হিন্দু' শব্দ সঠিক অর্থে সঠিক ভাবেই হয়েছে বিশ্বজনীন এবং বিশ্ববন্দিত। এই শব্দ নিজ সম্পুটে একই সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম অতীত সনাতনকে, বর্তমান বিবর্তনকে এবং অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সম্প্রসারণকে। এই শব্দ তাই আকাশের মতো অসীম, সমুদ্রের মতো গভীর।

'হিন্দু' শব্দ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু বলে কোনও একক বা আলাদা কিছু ধর্মমত নেই, সম্প্রদায় নেই। তাই হিন্দু নামে কোন আলাদা শাস্ত্রও নেই। এমনকি সুপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে বা রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণে এ নামের উল্লেখ নেই। এ নাম পরবর্তী কালের বাস্তব মূল্যায়নেরই ফলশ্রুতি, এতে সন্দেহ নেই। তাই পরবর্তীকালের শাস্ত্রে এই শব্দ পেয়েছে যথার্থ মর্যাদার স্থান। কারণ, এ শব্দ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে থেকে সকল সমভাবাপন্ন সম্প্রদায়কে ব্যক্ত করে।

তাই কেউ নিজেকে হিন্দু বললেই অনিবার্য হয়ে ওঠে পরবর্তী জিজ্ঞাসা—কোন্ সম্প্রদায়ের হিন্দু? অর্থাৎ সে হিন্দু বৈষ্ণব না হিন্দু শাক্ত? হিন্দু জৈন না হিন্দু বৌদ্ধ? হিন্দু শৈব না হিন্দু শিখ? হিন্দু বৈদান্তিক না হিন্দু রামকৃষ্ণাইত? ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দু শব্দ শুধু একটা common বা সামান্য অথবা সামগ্রিক পরিচয়। তাই এ শব্দ কখনই একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক শব্দ হতে পারে না অর্থাৎ হিন্দু

বলতে একাধারে বোঝায় সমভাবাপন্ন যে কোনও একক ধর্মমত, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল একক ধর্মমতের সমষ্টি।

আবার প্রাদেশিকতার সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডীকেও ভেঙে দিতে পারে এই হিন্দু শব্দই। হিন্দু শব্দে একই সঙ্গে অভিব্যক্ত হয় পাঞ্জাবী, বাঙালী, মাদ্রাজী, মারওয়াড়ী, অসমিয়া, ওড়িয়া, গোর্খা, মারাঠী, গুজরাটী, বিহারী ইত্যাদি সব প্রাদেশিক পরিচয়। বিভিন্ন প্রদেশের বর্ণময় বৈচিত্র্যের ফুলগুলি 'হিন্দু' শব্দের সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় একটি সুন্দর মালারূপে।

সেইজন্যই 'হিন্দু' শব্দের মধ্যে রয়েছে সংগঠিত শক্তি প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা। সব বিভেদ গণ্ডী বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে মিলিয়ে হিন্দুজাতিকে সমষ্টিরূপে সংগঠিত করতে পারার ক্ষমতা আছে এই শব্দের মধ্যে। তাই অহিন্দু বিধর্মীদের কাছে, অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশপরা হিন্দুবিরোধীদের কাছে, অথবা যারা divide and rule নীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতে শাসন-শোষণ কায়েমী করে রাখতে চায়, তাদের কাছে সত্যিই 'হিন্দু' একটি ভীতিপ্রদ শব্দ। তারা এই শব্দকে মুছে ফেলতে চায়, কলঙ্কিত করতে চায় কম্যুনাল ব'লে সাম্প্রদায়িক ব'লে। তার জন্য তাদের মারপ্যাঁচেরও অন্ত নেই। কিন্তু মেঘ কি সূর্যকে চিরকাল আড়াল করে রাখতে পারে? ছাই দিয়ে কি আগুনকে চেপে রাখা যায়? মেঘ কাটলেই সূর্য উঠবে, ছাই উড়লেই আগুন জ্বলবে, কে না জানে? তেমনি একদিন ফুটে উঠবেই হিন্দুত্বের মহিমা এবং 'হিন্দু' শব্দের মহিমা।

'হিন্দু' শব্দের শব্দার্থও ভাল। পণ্ডিতরা বলেন—'হীনং দূষয়তি স হিন্দুঃ' অথবা 'হীনং দূরয়তি স হিন্দুঃ'। অর্থাৎ হীনতাকে যে বর্জন করে সে-ই হিন্দু। হিন্দু একটি সদ্গুণবাচক শব্দ। সদ্গুণমণ্ডিত উচ্চচিন্তায় রত দিব্য সংস্কৃতিযুক্ত জাতিই হিন্দুজাতি। এর গুণমানই বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিজেকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতে ।

হিন্দুদের কথায় বিবেকানন্দ বলেছেন—"হিন্দুরা সর্ববিধ চিন্তাধারায় সাহসী—এত সাহসী যে, তাঁহাদের চিন্তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের তথাকথিত সাহসী মনীষীদের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহা একটি গৌরব ও কৃতিত্বের কথা। এই হিন্দু মনীষীগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার যথার্থই বলিয়াছেন, তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদেরই ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস ফাটিয়া যাইতো।"—একথা হৃদয়োচ্ছ্বাস মাত্র নয়, একথা পরম সত্য এবং যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা সর্বৈব প্রামাণ্য।

হিন্দুদের ধর্ম এতই প্রাচীন যে, ইতিহাস তার আরম্ভকে সালতামামি দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেনি। হিন্দুধর্ম কে সৃষ্টি করলো, কার দ্বারা জগৎসমক্ষে প্রথম প্রকাশিত হ'ল, তার নামও ইতিহাস বলতে পারেনি। এ কিন্তু ইতিহাসের দৈন্য নয়। এটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মের নিজস্বতা কিংবা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম অনাদি এবং অপৌরুষেয়। নির্দিষ্ট কোনও একজনের মতবাদ মাত্র হিন্দু শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়নি। তাই হিন্দুধর্ম একটিমাত্র শাস্ত্র এবং তার একজনমাত্র প্রবক্তার ওপর নির্ভরশীল নয়। যে অহিন্দুধর্মগুলির অস্তিত্ব মাত্র একজন প্রবক্তার ঐতিহাসিকতা ও একটিমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর, তাদের তুলনাই চলে না হিন্দুর সমুদ্র-গভীর বিশালত্বের সঙ্গে। শতসহস্র স্বাধীন নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশে থাকে। একটি দুটি নদী শুকিয়ে গেলেও সমুদ্রের কোনও ক্ষতি হয় না। আবার নিত্যনূতন নদীপথ এসে যুক্ত হলেও সমুদ্র তাদের উগলে দেয় না বরং স্বীয় অঙ্গে মিশিয়ে নেয়। প্রবক্তা ও গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা নিরপেক্ষ শাশ্বত অধ্যাত্ম চেতনার ও ভাবরূপের সমষ্টি বলেই হিন্দুধর্ম সমুদ্রবৎ অতল অনন্ত।

হিন্দুত্ব চরম এবং পরম তত্ত্বের সমুদায়, আদর্শসমূহের পুঞ্জস্বরূপ। সেই তত্ত্ব, সেই আধ্যাত্মিকতা, সেই আদর্শ, নিটোল রূপ পরিগ্রহ করেছে ঋষি মহর্ষি অবতার মহাপুরুষদের মধ্যে। তাঁরা শাস্ত্ররূপে তুলে ধরেছেন সেই চরম পরম জ্ঞানরাশিকে

এবং আদর্শরাশিকে। এই শাস্ত্রদ্রষ্টারা মানবদেহধারী পুরুষ হয়েও পুরুষসীমার অতীত। এঁরা সেই তত্ত্ব এবং আদর্শের প্রমুর্ত্ত বিগ্রহমাত্র, পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপ ব্যক্তি মাত্র। এঁদের স্বতন্ত্র পুরুষসত্তার কোনও দেহাভিমান নেই। তাই এঁরা জাগতিক আত্মপরিচয়কে গৌণ করে তাঁদের তত্ত্বোপলব্ধিকে জগৎসমক্ষে দিয়ে গেছেন নিছক মানবকল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাই তাঁদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম শাশ্বত সনাতন অপৌরুষেয়। তাঁদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের উপর ঐ সব তত্ত্ব, মূল্য ও আদর্শ নির্ভরশীল নয়। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই হিন্দুত্বকে নিয়ে গেছে সব গণ্ডীর পারে, অনাদি থেকে অনন্তে।

কোনও সীমিত গোষ্ঠীকে উপকৃত করার সংকীর্ণ ভাবনা থেকে মুক্ত বলেই বিশ্বজনীন এই হিন্দুধর্ম। অপৌরুষেয় অর্থাৎ প্রবক্তা-নিরপেক্ষ বলেই চিরন্তন এই হিন্দুধর্ম। এই কারণেই হিন্দুধর্ম যেমন অতীতের এবং বর্তমানের সব ধর্মমার্গকে হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম, তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের অসংখ্য প্রবক্তাদের ধর্মমার্গকেও সাদরে স্বাগত জানাতে সক্ষম। তাই 'হিন্দু' শব্দটি এত ভাবদ্যোতনার বাহক, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের দ্যোতক, এত উদার অসম্প্রদায়িক, দিব্যগুণাবলীর ধারক, এত আদর্শবহ, এত নির্দেশবহ, এতই সর্বগ্রাহী, সর্বগ্রাসী এবং শাশ্বত। তাই হিন্দু শব্দের চেয়ে উচ্চতর শব্দ আর কোনও ভাষা আবিষ্কার করতে অসমর্থ।

আসলে ভাষা তো ভাবসম্পদের বাহক মাত্র। এই অপূর্ব আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্যময়তা এবং তার মাঝে ঐক্যের প্রশ্ন আর কোথায় আছে? এ তো একমাত্র হিন্দুরই নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদকে সে তার নিজগুণে করেছে বিশ্বের কাছে অর্পণ। সে তার মহান্ উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

কিন্তু সেই উদারতা কখনই নিষ্ঠার বিনিময়ে নয়। নিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে আত্মপরিচয়ের গৌরব। হিন্দু যেন সে গৌরবকে ভুলে না যায়, সে কথা বহুভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ বলেছেন—"এখন আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। এই দুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দুসমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ, সেকালে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে — সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই।" "একটি কথা মনে রাখিও—তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্রস্বরূপ ধর্মের নিম্নে স্থান গ্রহণ করে। "..."শিক্ষাই বলিস্, আর দীক্ষাই বলিস্, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে।" ..."ভারতে যে কোনও সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হোক্, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক ও রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক।"

কার্যপ্রণালীর কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন—"একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে। আমার কার্যপ্রণালী —হিন্দুদের দেখানো যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব দূর করিতে হইবে। ...এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্মত্যাগী ও মিশনারীগণ উপদিষ্ট ধ্বংসের পথে নয় আমাদের নিজেদের ভাবে নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতাব্দীর অত্যাচার প্রাসাদ নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণকার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে সুন্দর দেখাইবে।"

বিবেকানন্দের অভিপ্রায়কে সার্থক করতে, তাঁর বাণী ও ভাবকে নামিয়ে আনতে

হবে বাস্তব জীবনের প্রয়োগক্ষেত্রে, এখন ওপর ওপর ভাসার সময় নয়। বৌদ্ধিক কচকচি, তর্কজাল বিস্তার, কিংবা ভাষার যাদুকরী দিয়ে মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে না। এখন চাই "Sincerity of purpose" —উদ্দেশ্যের সততা। তার জন্য প্রথম এবং অনিবার্য প্রয়োজন হিন্দুদের ভেতরে হিন্দুচেতনার জাগরণ, হিন্দুত্বের গৌরববোধ এবং সকল হিন্দুর সংহতি ও ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন। তবেই হিন্দুত্ব বাঁচবে, হিন্দুজাতি বাঁচবে। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনই জগৎবাসীকে আদর্শের পথ দেখাবে। মানবকল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণের এটাই প্রথম এবং অনিবার্য সোপান।

শ্রীঠাকুরের কৃপা আমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করুক, প্রেরিত করুক, এই প্রার্থনা!— "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

